ইক্যুইটিবিডি ক্যাম্পেইন পেপার, অক্টোবর ২০১৫

**বাংলাদেশ ও ভিশন-২০২১ঃ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নতীকরন লক্ষ্য**

# শুধু মধ্যম আয়ের দেশ নয় বরং মধ্যম মানের জীবনযাত্রার দেশ চাই

## ১. ২০২১ সাল ও সরকারের আত্মতৃপ্তিমূলক প্রচারনা

আগামী ২০২১ সাল, বাংলাদেশ সরকার এ সালকে নিয়ে প্রচারনায় ব্যস্ত, কারন ২০২১ সালে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে তথাকথিত নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হতে যাচ্ছে। এর সমর্থন হিসাবে ইতিমধ্যেই জাতিসংঘ থেকে এমডিজি অর্জনের উপর ব্যাপক প্রশংসা (যদিও এমডিজির বৈশ্বিক অর্জনে বাংলাদেশের অবদানের চাইতে চীনের অবদানকেই বৈশ্বিকভাবে বেশী স্বীকার করা হয়েছে, অথচ চীনের জন্য কোন পুরষ্কার নেই) এবং টেকসই পরিবেশ অর্জনে মাননীয় ধরিত্রী পুরষ্কার দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে এই নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হলে তা আমাদের জনগনের আসলে কোন উপকারে আসবে কিনা?? এটা সত্য যে সরকারী এবং বেসরকারী অব্যাহত সংগ্রামের ফলেই বাংলাদেশের দারিদ্রতা দূরীকরনের পথে অনেক অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, বিগত ৪০ বছরে দারিদ্রতা দূরীকরনের লক্ষ্যে আমরা যে সম্পদ বিনিয়োগ করেছি সে অনুসারে দারিদ্র দূরীকরন এবং জনগনের জীবন-মান উন্নয়নে সক্ষম হই নাই। যদি না হই তাহলে এই ২০২১ সালের তথাকথিত "নিম্ন-মধ্যম আয়ের" সার্টিফিকেটের আমাদের কোন প্রয়োজন রয়েছে, না সত্যিকার অর্থে জনগনের জীবন-মান কাংখিত স্তরে নেওয়ার জন্য ২০২১ সালকে আমরা অন্য কোনভাবে বা অন্য কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিদৃষ্ট করতে পারি যা আমাদের সত্যিকার অর্জনের দিকে ধাবিত করতে পারে? আমরা মনে করি আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদদের সেই বিশ্লেষণ করা উচিৎ।

## ২. বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক চিত্র

### ক. জনসংখ্যা এবং দারিদ্রতাঃ ২০৩০ সালের পরেও থাকতে পারে

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে স্বাধীন বাংলাদেশের শুরু হয়েছিল ৭.৫০ কোটি মানুষের দেশ হিসাবে। সে সময় বলা হয়েছিল ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যার দেশ এবং এ পরিমান আয়তনের কোন দেশে সর্বচ্চো ৪.৫০ কোটির মত মানুষ সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারে। সেই অনুমিতিকে সামনে রেখে ৮০'র দশকে দেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু করা হয়। কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা বিশেষ করে তৎকালীন সময়ে প্রায় ২.৬% জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে হ্রাস করে তা ২০০০ সালের মধ্যে ১.০% এর নীচে নামিয়ে আনা, যাতে করে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা তাত্বিকভাবে কাংখিত সীমার মধ্যে রাখা যায়। আজকে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটির কাছাকাছি। এই পরিমান জনসংখ্যা একটি সুন্দর এবং দারিদ্রমুক্ত ভবিষ্যত বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি কিভাবে তৈরী করতে তা আমাদের কাছে প্রশ্নসাপেক্ষ এবং এও বলা হচ্ছে যে, এই হার চলতে থাকলে আগামী ২০৩০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ২২.০ কোটিতে পৌছতে পারে।

দ্বীতিয়ত: জনসংখ্যা হ্রাসের সরকারের কার্যক্রম চোখে না পড়লেও বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত করার সরকারী প্রতিশ্রুতি অবশ্যই প্রশংসনীয়। সরকার তার নির্বচনী অঙ্গীকারে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্রের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং সংখ্যগত দিক দিয়ে হলেও তা অর্জনে সাফল্য দেখিয়েছে। তার পরেও বর্তমানে সরকারের হিসাব মতেই বাংলাদেশে বর্তমান দারিদ্রতার হার বিবিএসএর সর্বশেষ হিসাব মতে ৩১%, কিন্তু অর্থনৈতিক ও পরিকল্পনা বিভাগের প্রক্ষেপন অনুযায়ী তা ২৬% এর মত। সরকার তার "ভিশন-২০২১" লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চেষ্টা করছে এবং সে অনুসারে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে বর্তমান স্বল্পোন্নত দেশ থেকে একটি মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে এবং বিশ্বব্যাংকের সহযোগীতায় হয়ত আগামী ২০১৮ সালের মধ্যে তথাকথিত মধ্য আয়ের দেশের সার্টিফিকেট গায়ে লাগতে পারবে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হবে, জনসংখ্যার বর্তমান উর্ধ্বগতি (১.৬%), দারিদ্রতা হ্রাসের বর্তমান প্রবনতা (১%), বাজার অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে সৃষ্ট নতুন করে দারিদ্রতা এবং জনসংখ্যার বয়স কাঠামো ইত্যাদি বিবেচনায় ২০২১ সালে প্রায় ১৫-২০% মানুষ এবং ২০৩০ সালের পরেও প্রায় ১০-১২% মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করতে পারে।

## ৩. কেন এই দারিদ্রতা থেকে যেতে পারে?

### ক. প্রবৃদ্ধিই দারিদ্রতা হ্রাসের একমাত্র চালিকাশক্তি হতে পারে না

অর্থনীতির তত্বানুযায়ী দারিদ্র দূরীকরনের সাথে প্রবৃদ্ধির সরাসরি কোন সম্পর্ক নাই। বলা হয়ে থাকে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে তা দারিদ্রতা হ্রাসে ভুমিকা রাখতে পারে এবং সেটা নির্ভর করবে অর্জিত প্রবৃদ্ধি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ কিভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা যায় তার কৌশলের উপর। সে অনুযায়ী ১% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে এবং তা যদি সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা যায় তবে সেক্ষত্রে ০.৫% হারে দারিদ্রতা হ্রাস করবে। বাংলাদেশে গত এক দশক ধরে ৫-৬% এর উপরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে প্রতি বছরই প্রায় ৩% হারে দারিদ্র হ্রাস পাওয়ার কথা। কিন্তু অর্জিত প্রবৃদ্ধির অসম বন্টনের কারনে দরিদ্রতা হ্রাসের কাংখিত লক্ষ্যমাত্র অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। সরকারের একমূখী (প্রবৃদ্ধি মূখী) উন্নয়ন কৌশল অনুসরনের কারনে দারিদ্রতা দূরীকরনের অন্যান্য খাত যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীন ক্ষুদ্র আয়তন অর্থনৈতিক কার্যবলীর উন্নয়ন এবং পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়সমুহ উপেক্ষিত হয়েছে এবং সেখানে প্রয়োজনীয় সরকারী বিনিয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব না হয় নাই। ফলে দেশে তথাকথিত আয়-দারিদ্রতা হয়ত: কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু জনগনের জীবন মানের কোন প্রকার উন্নতির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

### খ. ধনীরা হচ্ছে প্রবৃদ্ধির সুফলভোগী, দরিদ্ররা বঞ্চিত গোষ্ঠী

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির সেক্টর বা খাতগুলো নির্ধারিত হয়েছে শিল্প ও কথিত সেবা খাত, বাদ দেওয়া হয়েছে গ্রামীন ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক কার্যাবলী এবং কৃষির মত গুরুত্বপূর্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী দারিদ্র-বান্ধব খাতসমুহ। আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকারী বিনিয়োগ বেশীরভাগই যাচ্ছে শিল্প-সহায়ক খাতসমুহ যেমন রাস্তাঘাট, বন্দর যোগাযোগ এমন সব উন্নয়ন খাতে। যার ফলে এসকল সেক্টরের অর্জিত প্রবৃদ্ধির সিংহভাগ অনেক ক্ষেত্রে বলতে গেলে ১০০% সুফল ভোগ করছে সামজের ধনিক গোষ্ঠী। এই প্রবৃদ্ধির চুইয়ে পড়া (Trickle Down) সুফল হিসাবে কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হয়ত: হয়েছে, কিন্তু বিপরীতে হারিয়েছে তাদের জমি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায়সমুহ এবং তাদের জীবন যাত্রার মান নেমে এসেছে অত্যন্ত মানবেতর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান এই প্রবনতা লক্ষ্য করে আমাদের মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান কান এক সেমিনারে দুঃখ করে বলেছিলেন "বাংলাদেশে উচ্চবিত্ত ও ধনীরা দ্রুতগতিতে সম্পদ বাড়াচ্ছে আর দরিদ্র মানুষগুলো সম্পদ হারিয়ে কোন রকমে খড়কুটো ধরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। এ অবস্থার ছন্দপতন হলেই তারা আবারও বিপদের (দারিদ্রের মধ্যে) পড়বে"।

### ৪. ৮৬% মানুষকে নিম্ন আয়ের ফাঁদে রেখে মধ্যম আয়ের দেশ আসলে কিভাবে সম্ভব?

বাংলাদেশে গত দুই দশক ধরে ৫-৬% কিংবা এরও বেশী প্রবৃদ্ধি অর্জন হলেও এর সাধারন সুফল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে যায়নি। যার ফলে দরিদ্র মানুষের আয় বাড়েনি বরং তারা ক্রমান্বয়েই নিম্ন আয়ের ফাঁদে আটকা পড়ছে। বিশ্বব্যাংকের গবেষণা (বিশ্বব্যাংকের দারিদ্র পর্যালোচনা প্রতিবেদন ২০১৪, সুত্র: বণিক বার্তা ১৯.১১.২০১৪) তথ্যানুসারে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জনে সাফল্য সত্বেও বাংলাদেশে প্রায় ১২ কোটি ৭৫ লাখ (৮৬%) মানুষ দৈনিক ২.৫ ডলারের কম আয় করে। উন্নয়নের নামে এই প্রহেলিকায় সমাজে আয় ও সম্পদ বৈষম্য বেড়েই চলছে। ফলে রাস্তায় বিলাস বহুল গাড়ি, শহরে নতুন নতুন মাল্টিপ্লেক্স বা উচ্চ অট্টালিকা ইত্যাদি দৃশ্যের বিস্তার ঘটলেও সাধারন মানুষ আটকা পড়ছে নিম্ন আয়ের ফাঁদে। নিম্ন আয়ের ফাঁদ হচ্ছে অর্থনীতির দারিদ্রিক দুষ্ট চক্র (Vicious Circle of Poverty) যার প্রতিক্রিয়ায় মানুষ তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে না, অথচ তাদের শ্রম ও মজুরীর বিনিময়ে যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় তা ক্রম-সঞ্চিত হয় পুজিঁপতিদের ঘরে। আমরা বাংলাদেশের পোষাক খাতে এ ধরনের প্রবনতা লক্ষ্য করে যাচ্ছি, অন্যান্য শিল্প ও সেবা খাতেও হয়ত রয়েছে কিন্তু বিষয়গুলোর সেভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে না। উচ্চ প্রবৃদ্ধি সত্বেও বাংলাদেশের পোষাক খাতের মজুরী কাংখিত পর্যায়ে বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না শুধু সরকারের কার্যকর নীতিমালার অভাবে। ফলে এর সাথে জড়িত ৪০ লাখ শ্রমিক এবং এদের পরিবারসহ প্রায় দুই কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের ফাদে আটকা পড়েছে, যা উদাহারন স্বরূপ বলা যায়। অথচ পোষাক খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার প্রতি বছরই তার নিজস্ব সম্পদ থেকে ভর্তূকী দিয়ে আসছে এবং ঋণ নিয়ে বিভিন্ন আবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করছে, যার ভার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকেই প্রকারান্তরে বহন করতে হচ্ছে।

### ৫. "মধ্যম আয়ের দেশ" ধারনটি আসলে এক ধরনের বৈশ্বিক রাজনৈতিক-অর্থনীতির ফাঁদ

তথাকথিত "নিম্ন আয়ের দেশ, নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ ও উচ্চ আয়ের দেশ" ইত্যাদি অর্থনৈতিক টার্মস বা পরিভাষা আসলে আমাদের দেশে অর্থনীতিতে জেকে বসা ঋণ ব্যবসায়ী বিশ্বব্যাংকের সৃষ্ট কিছু সার্টিফিকেট। কারন এর মাধ্যমে তারা যাতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে অধিক লাভে ঋণ ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করাই এসকল তথাকথিত পরিভাষা সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এর সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন সম্পর্ক নাই, কারন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জনগনের মাথঅপিছু আয় ছিল ৫০-৬০ ডলার। দীর্ঘ ৪০ বছরে বাংলাদেশের জনগনের অব্যাহত অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং বেঁচে থাকার যে চেষ্টা তার ফলস্বরূপ আজকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দাড়িয়েছে ১২৩৫ ডলারে, ২০১৭ সালে তা হবে ১৫০০ ডলারে এবং ২০২১ সালে হয়ত হবে ১৭০০ ডলারে,এভাবেই বাড়তে থাকবে। এখানে বিশ্বব্যাংকের অর্থনৈতিক সহযোগীতার কোন সম্পর্ক নাই। কারন নিম্ন আয়ের দেশ হিসাবে থাকলে বাংলাদেশকে যে সকল ঋণ দিতে হবে তা মূলত কনসেশনাল এবং অনেক ক্ষেত্রে সুদবিহীন। পক্ষান্তরে তথাকথিত নিম্ন-মধ্যম আয়ের সার্টিফিকেট বাংলাদেশের হাতে ধরিয়ে দিতে পারলে সেক্ষত্রে কনসেশনাল ঋণ দিতে হবে না, বরং যে সকল ঋণ দেওয়া হবে তার উপর ৬-৭% হারে সুদ আদায় করতে পারবে। ফলে বাংলাদেশে ডেট সার্ভিস পেমেন্ট এর পরিমান বেড়ে যাবে। কারন বিশ্বব্যাংকের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে বাংলাদেশের রেমিটেন্স, রফতানী আয় এবং রাজস্ব আয়ের উপর। এমনিতেই বর্তমানে রাজস্ব আয়ের ৩০% চলে যাচ্ছে ডেট-সার্ভিস পেমেন্ট এ, তারপরও যদি নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ করে দেওয়া যায় তাহলে আরও সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে।

### ৬. আমরা মধ্যম আয়ের দেশ চাই না বরং মধ্যম মানের জীবনযাত্রার দেশ চাই

সরকার বিগত কয়েক দশক ধরে প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও পরিসংখ্যান বলছে দেশে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, গ্রামাঞ্চলে টেকসই কর্মসংস্থানের অভাবে মানুষ শহরমূখী হচ্ছে, পর্যাপ্ত বিনিয়োগরে অভাবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সেবা ও গুনগত মান উভয়ই হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষিত বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলস্বরূপ এখন পর্যন্ত প্রায় ৮৬% মানুষ নিম্ন আয়ের মধ্যেই আটকা রয়েছে। আমরা এই অবস্থার অবসান চাই। তথাকথিত জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে শুধূমাত্র প্রবৃদ্ধি নির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আমাদের প্রত্যাশা নয়। প্রবৃদ্ধি এবং দেশের উন্নয়ন দুটো সম্পূর্ন পৃথক ধারনা। দেশের প্রকৃত উন্নয়ন করতে হলে জনগনের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে জনগনের জীবন-মান উন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা অবশ্যই প্রয়োজন এবং তা করতে প্রবৃদ্ধির পুনঃবন্টন ও বিনিয়োগরে দিকে নজর দিতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশের পাশাপশি মধ্যম মানের জীবনযাত্রাও নিশ্চিত হবে। আমরা মনে করি বিশ্বব্যাংকের তথাকথিত মধ্যম আয়ের সার্টিফিকেটের ফাঁদে পা না দিয়ে সরকারকে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে "মধ্যম মানের জীবন যাত্রা" লক্ষ্য অর্জনের কাজ করা উচিৎ এবং সেক্ষেত্রে এখন থেকেই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর নজর দেওয়া উচিৎ;

### ক. নিম্ন আয়ের ফাঁদ থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আয় ও সম্পদ স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে

আগামী ২০২১ সালে মধ্যে মধ্যম মানের জীবনযাত্রা অর্জন করতে হলে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে। তাদেরকে শুধু দুবেলা খাবোরের ব্যবস্থা করলেই হবে না বরং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় ও সম্পদ

বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে, পাশাপাশি তাদের জীবন যাত্রার ব্যয়ও কমানোর দিকে নজর দিতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচি রয়েছে, কিন্তু এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এটাই প্রতিফলন দেয় যে, দেশে সংখ্যাগত দারিদ্রতা হ্রাস করা সত্বেও দারিদতা হ্রাসের গুনগত মান বৃদ্ধি পায়নি, যে কারনে দারিদ্রের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমান্বয়েই কঠিন হয়ে পড়ছে (মানুষ নিম্ন আয়ের ফাঁদে আটকা পড়ে যাচ্ছে)। এরকম প্রেক্ষাপটে সরকারের নীতি ও লক্ষ্য হওয়া উচিৎ সামাজিক কর্মসুচির চাহিদা যাতে ভবিষ্যতে না বাড়ে তার দিকে লক্ষ্য রেখে দারিদ্র বিমোচন কৌশল প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদ স্থানান্তরের (Asset Transfer Policy) নীতি গ্রহন করতে হবে। তবে এর জন্য যে সম্পদ সমাহারন দরকার, তার কৌশল অবশ্যই হতে হবে প্রগতিশীল (Progressive resource mobilization policy)। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, সরকারের গৃহীত বর্তমান সম্পদ সমাহারন নীতি বিশেষ করে সরকারের আর্থিক নীতি (Fiscal Policy বা রাজস্ব আহরন নীতি) দারিদ্র বিমোচনের দৃষ্টিকান থেকে অত্যন্ত Regressive বা অবদমনমূলক। এর প্রকৃষ্ট উদাহারন হচ্ছে সরকারের নতুন মূল্য সংযোজন কর (VAT) আইন ও নীতিমালা যা ইতিমধ্যেই বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। আমরা মনে করি বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে গ্রামীন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এবং দরিদ্র জনগনের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপন্যের উপর VAT আরোপ নীতি থেকে সরকারের সরে আসা উচিৎ।

### খ. প্রবৃদ্ধির সুফল তৈরী করতে হবে এবং দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে

গত কয়েক দশকে প্রবৃদ্ধির কারনে জিডিপি এর আকার বেড়েছে ঠিকই কিন্তু তা থেকে অর্জিত সম্পদ দরিদ্রদের দারিদ্রতা দূর করার জন্য গতানুগতিক ধারার বাইরে কোন বিনিয়োগ করা হয় নাই বরং প্রবৃদ্ধি থেকে অর্জিত জাতীয় সম্পদ পুনরায় পুজিঁপতি সুবিধায় বিনিয়োগ করা হয়েছে। উদাহরনস্বরূপ প্রবৃদ্ধি থেকে অর্জিত রাজস্ব দারিদ্র বিমোচন অবকাঠামোয় (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি) বিনিয়োগ না করে তা যোগযোগ অবকাঠামো, বন্দর উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণ নিয়েও তা করা হয়েছে। ফলে এদেশের প্রবৃদ্ধির সুফল এবং তা থেকে অর্জিত জাতীয় সম্পদ উভয়ের সুফল ভোগ করছেন পুজিপতিরা। বিপরীতে সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে পারে নাই, বরং দেখা যাচ্ছে প্রবৃদ্ধির থেকে অর্জিত জাতীয় সম্পদের বেশীরভাগই চলে যাচ্ছে সুদ পরিশোধ পুজিপতিদের শিল্প রক্ষায় ভর্তূকী-প্রনোদনা ইত্যাদি খাতে। আমরা প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিরুদ্ধে নই, কিন্তু প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে গিয়ে সাধারন মানুষকে দারিদ্র-ফাঁদে আটকে দেওয়ার এরকম অবস্থা পুনঃবিবেচনা করা প্রয়োজন। তাই জাতীয় স্বার্থে সরকারকে অবশ্যই দারিদ্র-বিমোচন নীতি ও কৌশল পরিবর্তনের লাগসই পথ খুজতে হবে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিনত না করতে পারলে কোন অবস্থাতেই তাদের জীবন যাতার মান উন্নয়ন সম্ভবপর হবে না এবং রাষ্ট্রও এই জনগোষ্ঠী থেকে কোন সুবিধা পাবে না।

### গ. আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করতে হবে

অর্থনীতিবিদদের অনেকেই মনে করেন যে, উন্নয়নের একটা পর্যায়ে সম্পদ বন্টনে অসামঞ্জস্য হ্রাস করা সম্ভব না হলে তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ক্ষতি হয়ে উঠতে পারে বিশেষ করে সামাজিক বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য খুবই প্রকট আকার দেখা দিয়েছে, বিগত দশকেও (২০০০সালে) বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সূচক ছিল ০.৩৯ যা ২০০৫ সালে ০.৪২, ২০১০ সালে ০.৪৩ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই সূচক বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ০.৪৬ এ যা ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের ইঙ্গিত বহন করে । যদিও আমাদের বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদরা বলছেন উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে এরকম আর্থ-সামাজিক বৈষম্য থাকতেই পারে কিন্তু বৈশ্বিক উদাহারনে ভিন্ন দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি আয় বন্টনের বৈষম্য কম রাখতে পেরেছে কিন্তু বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপশি আয়-বৈষম্য ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলছে, যার ফলাফলই হচ্ছে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী নিম্ন আয়ের ফাঁদে আটকা পড়েছে। প্রবৃদ্ধির উক্ত সমস্যা বিশ্লেষনে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন মন্তব্য করেছেন যে, শুধু প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের স্বাদ এনে দিতে পারে না। উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা অর্থাৎ খাদ্যের নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিশূদ্ধ পানি, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাই হচ্ছে উন্নয়নের অন্যতম উপকরন। আর এটা হচ্ছে ভারসাম্যমূলক উন্নয়নের ধারনা এবং বাংলাদেশে এর অনেকগুলোরই সংকট রয়েছে এবং সরকারকে এদিকেই নজর দিতে হবে।

### ঘ. সু-শাসন ছাড়া ভারসাম্যমূলক উন্নয়ন সম্ভব নয়

বাংলাদেশের অর্থনতিক উন্নয়নের বড় একটি অন্তরায় হচ্ছে দূর্নীতি। অর্থনীতিবিদদের হিসাব অনুসারে শুধূ দূর্নীতির কারনে প্রতি বছর জাতীয় আয়ের ২-২.৫% অর্থের অপচয় হয়। শুধূ অর্থের অপচয় ছাড়াও দূর্নীতির বহুমূখী প্রভাব রয়েছে যেমন, দূর্ণীতির কারনে সরকারের প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি তা বাস্তবায়নে বিলম্বিত হয়। ফলে জনগন এর সুবিধাবঞ্চিত এবং এমনকি প্রকল্পের সুবিধা ও মূল উদ্দেশ্যও বাধাগ্রস্থ হতে পারে। দারিদ্র দূরীকরনে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচি এর প্রকৃষ্ট উদাহারন বলে আমরা মনে করি। বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে দূর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন বিশেষ করে দূর্ণীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার অঙ্গীকার করলেও বাস্তবে এর কিছুই হয়নি বরং এর স্বাধীনতা ও ক্ষমতা আরও খর্ব করা করা হয়েছে। যে কারনে দুদুকের চেয়ারম্যানের মূখে শুনতে হয়েছে "দুদুক এখন নখ-দন্তহীন বাঘ"। ফলে দুদুক মুখে দূর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বললেও কার্যতঃ বিভিন্ন দূর্নীতিবাজ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে যে ক্লীন সার্টিফিকেশন দিচ্ছে তা দেখে আমরা আসলে হতাশ। আমরা মনে করি দেশ যতই প্রবৃদ্ধি অর্জন করুক না কেন, দূর্নীতি থাকলে কোন উদ্দেশ্যই সফল হবে না, বরং দূর্নীতি দমন হলেই দরিদ্ররাই সর্বাগ্রে সকল উন্নয়নের এর সুফল পাবে।

**সচিবালয়:** ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩, রোড: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭ ফোন: ০২-৮১২৫১৮১, ৯১১৮৪৩৫
ই মেইল: info@equitybd.org. ওয়েব: www.equitybd.org
**যোগাযোগ:** রেজাউল করিম চৌধুরী, ইক্যুইটিবিডি, ইমেইল: reza@coastbd.org, মোবাইল:০১৭১১৫২৯৭৯২
আমিনুল হক, ইক্যুইটিবিডি, ইমেইল: aminul@coastbd.org, মোবাইল:০১৭১৩৩২৮৮১৫